বৃষ্টির পাঠ

জহিরুল ইসলাম নাদিম

লেখকের প্রকাশিত বই

সবার জন্য ক্রিকেট (২টি সংস্করণ-১৯৯৬)

ক্রিকেটের আইন কানুন (২টি সংস্করণ-১৯৯৮)

হৃদা (উপন্যাস-১৯৯৮)

এক প্রহরের ভালোবাসা (ছোটগল্প-২০০০)

চশমা চেরাগ (ছড়া-২০১১)

জহিরুল ইসলাম নাদিম

বৃষ্টির পাঠ

অন্তর্জাল প্রকাশনী ॥ ঢাকা

© লেখক
প্রথম প্রকাশ
জুন ২০১১

প্রকাশক
অন্তর্জাল প্রকাশনী
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও টাইপ সেটিং
জহিরুল ইসলাম নাদিম

ভালবাসার আনুকুল্যে নন্দিত হলো। বিক্রয়ের জন্য নয়।

BRISHTIR PATH (A collection of selected poems by Johirul Islam Nadeem)

উ ৎ স র্গ

যাকে দেখার জন্য এ মন উতল হয়ে থাকে
তাকে!

সূচীপত্র

পংক্তিগুলো ভালোবাসার ৭
কবিতার মুসাবিদা ৮
অনিবার্য কবিতা ৯
সুন্দরবন ১০
পাখিটার নাম জানিনা ১১
জীবন-পত্র ১২
যোগসূত্র ১৩
ভারকেন্দ্র ১৪
সেই তো ভালো ১৪
দিন যায় ১৫
নিবেদিত ১৬
স্মৃতিশক্তি ও দুর্বলতা ১৭
জীবন ঘুড়ি ১৮
বৃষ্টির পাঠ ১৯

পংক্তিগুলো ভালোবাসার

তোমার জন্য সাত সমুদ্র
তিন শ তের নদী
আমার হাতে হাতটি রেখে
একটু হাঁটো যদি।

আমাজনের ঘন সবুজ
নীলের সুনীল জল
আমায় ভেবে ডাগর দুচোখ
করলে ছলোছল্।

বিষধরের ফণা থেকে
আনব মণি ছিনে
হাজার জনের মধ্যে যদি
আমাকে নাও চিনে!

মাতাল করা বাতাস দেব
সঙ্গে চাঁদের আলো
ভুল করেও আমায় যদি
একটু বাসো ভালো!!

কবিতার মুসাবিদা

১
ধরা যাক নাম তার
সমুদ্র নিষাদ।
এক চোখে তার দেখি
আলোকের ঝিকিমিকি
আর চোখে ঝুলে থাকে
গভীর বিষাদ!

২
সমুদ্র নিষাদের মন ভালো নেই
বিবর্ণ দিনটাতে তাই আলো নেই!

৩
তুমি কোথায় আর আমি কোথায়?
মাঝখানে তের নদী পড়ে থাকে হায়!

৪
অর্ধেক পৃথিবী উজিয়ে এসে
মনের বনে দোলা দিয়ে যায় সে!

অনিবার্য কবিতা

তোমার হাতে হাত রেখেছি
হাত কি লাগে হাতে?
মাঝখানে যে সূক্ষ্ম ফারাক
পর্দা দেয়া তাতে!

সরল মনে তোমার চোখে
যখন রাখি চোখ
হৃদয় নদীর পাড় ধসে যায়
উথলে ওঠে শোক।

তোমায় ভীষণ ভালোবাসি
বলছি বারংবার
সত্যি আমি বইতে পারি
এমন কথার ভার?

দোষ যে কোথায় ঠিক জানি না
সত্যি প্রিয়তমা
তবুও যদি ভুল হয়ে যায়-
পারলে কোরো ক্ষমা।

সুন্দরবন!

হঠাৎ সেদিন সুন্দরবন
পায়ে পায়ে পথচলা
দৃষ্টিতে ছিল মুগ্ধতা দেখে
প্রকৃতির ছলাকলা।

পরতে পরতে লুকনো রয়েছে
ভয়ানক সুন্দর
দেখতে এসেছি ফেলে দিয়ে সব
নাগরিক ভয়-ডর।

জোয়ারেতে যদি এক রূপ হয়
ভাটাতে অন্য রূপ
কখনো সে বুনো কোলাহলে মাতে
কখনো সে নিঃশ্চুপ।

পাখ-পাখালির কলগুঞ্জনে
ঘুম যেই ভাঙলো
বিস্ময়ে দেখি চিত্রার্পিত
হয়ে আছে বাংলো।

দাঁড়িয়ে রয়েছে সুন্দরী গাছ
লাখো লাখো শ্বাসমূল
বিরহী বধূর কান্না জড়ানো
নাকে যেন নাক ফুল।

শুনতে পেয়েছি গোলপাতা বনে
বাতাসের ঝিরি ঝির
লোনা জলে কান উঁচিয়ে ঝিমায়
সতর্ক কুম্ভীর।

প্রকৃতির লনে দল বেঁধে ফেরে
হরিণের দল অই
শিকার দেখছি চোখের সামনে
শিকারীর খোঁজ কই?

পাখিটার নাম জানি না

বলতে গেলে একটা পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছে আজ।
যদিও প্রাত্যহিক অন্য সব শব্দ যথারীতি কর্ণকুহরে ঢুকে
অন্তঃকর্ণের বারোটা বাজানোর তালে ছিল
তবু কেন যেন কোথা থেকে পাখিটার ডাকেই
ঘুমটা প্রথম ভাঙল।

চোখ খুলে অবশ্য পাখিটাকে দেখলাম না।
জানালার ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা
পর্দার জন্যই দেখলাম না তা নয়।
কারণ পর্দা সরালেও চোখের চৌহদ্দিতে আলসারের মতো বেড়ে ওঠা
কুৎসিত বহুতল ভবনটাই ধরা পড়ত।
অনেক দিন হলো আমার কাছে জানালা মানে
চক্ষশূল ওই ভবনটার প্রায় বিবর্ণ একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়!
তাই পাখিটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম না
তবে চেষ্টা করাটা দরকার ছিল।
পাখিটার নাম যে জানি না!
চাপা মারছি ভাববেন না!
শহুরে কবির অভিধানে আজকাল ফুল, পাখি আর তারাদের কোনো
স্থান আছে না কি!
পাখি তো কেবল প্রাণহীন বই পড়েই চিনেছি-
কাক, চিল আর চড়ুই ছাড়া আর কোন মুক্ত বিহঙ্গকে দেখেছি?
টবে ফোটানো দুই একটা গোলাপ ছাড়া আর কোন কুসুমকে
সঠিক নামে শনাক্ত করার যোগ্যতা রাখি!

পাখিটা কাছে ধারেই ছিল
নইলে মধ্যরাত পার করে ঘুমোনো গাঢ় নিদ্রাকে সে তার
মিঁহি সুরে ভাঙ্গতে পারত না।
কিন্তু এই পাষাণ গদ্য জীবনে হঠাৎ
কবিতার মতো বিহঙ্গ কেন এলো?
কূল-কিনার না পেলেও ভাবতে ভালই লাগছে!

জীবন-পত্র

মিষ্টি শৈশব আর দুরন্ত কৈশোর পার হয়ে
যৌবনের দুর্বিনীত চোরাবালিতে পা রেখেছি অনেক কাল হলো।
ঠিক গন্তব্য ও লক্ষ্য জানা নেই
শুধু জানি সামনে যেতে হবে
পথ যত বন্ধুর আর কন্টকাকীর্ণ হোক না কেন
এ চলার শেষ নেই!

সুলতানের চিত্রকর্মের মতো কাদা-পানিতে আটকে যায়
জীবন গাড়ির চাকা;
তবু ইচ্ছের পেশী ফুলিয়ে
দাঁতে দাঁত চেপে
ঠেলে যেতে হয় ঠেলাগাড়ি জীবন!
কতো সাধের স্বেদ বিন্দু যে অবহেলায় ঝরে পড়ে-
কেউ তার খোঁজও রাখে না।

কী আছে সামনে?
হয়তো উজ্জ্বল আলোকময় অলৌকিক কোনো শেষ ঠিকানা
আবার কৃষ্ণগহ্বরের মতো অসীম নিকষ আঁধারও থাকতে পারে!
জানা নেই।
কারো জানা থাকে না।
শুধু এগোতে হবে এটাই জানা থাকে, জানি।
(সেই অমোঘকে তো মেনে নিতেই হবে।)

যোগসূত্র

ভালোবাসা কাকে বলে ঠিক জানিনা
সত্যি বলতে কী হর হামেশা শব্দটি শুনতে শুনতে
এর প্রতি এক রকম বীতশ্রদ্ধই হয়ে পড়েছি।
বাংলা চলচ্ছবির উচ্চৈঃস্বরের অপরিপক্ক সংলাপে
বা স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিজ্ঞাপনবিদীর্ণ নাটুকেপনায়
'আমি তোমাকে ভালোবাসি' শব্দত্রয় বহুল ব্যবহারে
এখন বাসি হয়ে গেছে!

বাক্যটির অন্তর্গত শক্তি উপলব্ধি করে বা না করে
ঝানু অভিনেতার দল দারুণ পারঙ্গমতায় কণ্ঠ থেকে
হৃদয়ের উপাদান বের করে আনতে পারেন।
তবে শেষ পর্যন্ত সেটা অভিনয়ই।

কখনো কখনো মনে হয় এই ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ শব্দটির মাহাত্ম্য
অন্য খানে, অনেক উঁচুতে।
মাঝে মাঝে তার সামান্য আভা ভোরের কুয়াশার মতো
মনের পার্দায় উঁকি দিয়েই মিলিয়ে যায়।

যখন তোমাকে দেখি- শান্ত ঝিলের জলে
ঢিল পড়বার আন্দোলন মনের কিনারে টের পাই।
হয়তো এর নামই ভালোবাসা।

জলে ডুবতে থাকা মানুষের কাছে খড় কুটোরও অনেক দাম।
মানবিক অস্থিরতার বিপন্ন সময়গুলোতে তোমার সান্নিধ্য
তার চেয়েও বেশি ভরসা যোগায়।
তাহলে এটাই কি ভালোবাসা?

অনবধানতায় তোমার হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে
যে বারো হাজার ভোল্টের বিদ্যুত তড়িতাহত করে আমাকে
বোধ করি তাও ভালোবাসাই।

নিতান্ত অবহেলায় পাঠানো তোমার একটি ক্ষুদেবার্তা
যে আমার অস্তিত্বকে প্রবল ভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়
তাকে কী বলে অভিহিত করব?

যদি উপর্যুক্ত অনুজ্ঞার একটাও সত্য হয়
তাহলে তোমার সাথে আমার যোগসূত্রটা, বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভালোবাসাই।

ভারকেন্দ্র

মন উচাটন কেমন কেমন
অস্থিরতা-বিষণ্নতা
স্বপ্নপালক ভাসল কোথায়
কোনদিকে তার যাওয়ার কথা!

চৈতন্যের ভারকেন্দ্র
হঠাৎ করেই নড়ে গেল
অপার্থিব এক ভাল্লাগাতে
মনের বাড়ি ভরে গেল।

সেই তো ভালো

সেই তো ভালো কাছের চেয়ে
দূরে আছি দূরেই থাকা
লাভ কী বল পূরণ করে
আছে যে ঘর শূণ্য ফাঁকা?

রইবো দূরে সেই বিরহে
মনটা খানিক জ্বলুক না হয়
মনে মনেই মনের কথা
মন দুটোতে বলুক না হয়।

দেখে দেখে সব প্রিয় মুখ
অপ্রিয় হয় হঠাৎ নাকি?
লাভ কী বল ও সব করে
মিলন আছে থাক না বাকি!

দিন যায়

দিন যায় কথা যায় না
গলায় বেঁধা কাঁটার মতো খোঁচায় নিরন্তর
এই মনে হয় সরে গেছে
পরেই ভাঙ্গে ঘোর।

দিন যায় স্মৃতি মোছে না
বুকের গভীর সিন্ধুকে সে রয় যে অনুক্ষণ
যায় না বোঝা কখন করে
মনকে উচাটন।

দিন যায় আশা ফুরায় না
বিশাল বড় অপ্রাপ্তিটাই এই জীবনের সার
বালির ভেতর মুখটি গুঁজে
যাই করে সংসার!

নিবেদিত

ফাগুন দিনে মনটা ওঠে নেচে
তেমন কিছু হয়না বহুকাল
মাঝ বয়সে সব গিয়েছে কেঁচে
দোলাচলে কাটল বুঝি তাল!

জামা জুতোয় আজ বয়সের ছাপ
বিকেল বেলা ফুটল ভোরের ফুল
ভাবতে গেলে বেশ মেলে উত্তাপ
কেমন করে হলো এমন ভুল?

স্মৃতিশক্তি ও দুর্বলতা

স্মৃতি যে এক ধরণের শক্তি তা ছোটবেলায় প্রথম টের পাই।
যাই পড়তাম দিব্যি মনে থাকত।
অবন ঠাকুরের বই থেকে শুরু করে সুকুমার রায়
সব লেখাই এক নিঃশ্বাসে উগড়ে দিতে পারতাম
উল্লেখ করার মতো কোনো বিচ্যুতি না ঘটিয়েই।

বাবার সাথে সিনেমা দেখতে গেলে
বাড়ি ফিরে ছবির পুরো কাহিনী গড় গড় করে বলতে পারা
ছিল লুডু খেলার মতো সহজ কাজ।
আরেকটু বড় হলে গোটা রবীন্দ্র সমগ্র
মাথার ভেতর চালান করে দিয়েছি।
প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে একটি দুটি সোনার মোহর
তুলে আনতে কখনো কসরৎ করতে হয়নি।

যে শুনেই সব মনে রাখতে পারে তাকে শ্রুতিধর বলে।
তার চেয়ে বেশি, বলতে নেই, একদম ফটোগ্রাফিক মেমোরি ছিল আমার।
এক পলক দেখেই সব মনে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা।
কিন্তু হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করলাম যে আমিও ভুলে যাই!
নাকের ডগায় চশমা রেখে কী কেলেঙ্কারি কান্ড
কেবল থানায় ডায়রী করা বাকি রাখলাম সেটা খুঁজে পেতে!
গত সাতদিনে মোট দুবার
ভেতরে চাবি রেখে বাইরে তালা মেরে দিয়েছি।
আর সেদিন আমার প্রিয় মোবাইলের দরকারী কভারটি
কোথায় যে ভুলে রেখে এলাম মনেই করতে পারছি না।

ভয় পেয়েছি খুব।
তুচ্ছ জিনিস-পত্র হারানোর জন্য নয়, হারানোর কারণটির জন্য।
বুড়িয়ে যাচ্ছি নাকি?

এক সময় যা ছিল শক্তি
সময়ের নির্মম কারসাজিতে তাই হয়ে গেল দুর্বলতা।
কী অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য!

জীবন-ঘুড়ি

ছোট বেলায় একটা নেশা খুব ভোগাত আমাকে।
ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা।
কত বিষণ্ণ দুপুর নাটাইয়ের বক্রতায় জড়িয়ে নিয়েছি
তার ইয়ত্তা নেই।
ছাদ থেকে ছাদে ঘুড়ির গন্ধ শুঁকে শুঁকে লাফিয়ে বেড়িয়েছি
প্রায়শঃই বিপজ্জনক দূরত্ব অবলীলায় পার হয়ে গেছি দীর্ঘ লম্ফের আদলে
পরোয়া করিনি কোনো।
ভেবেছি অই এক টাকার ঘুড়িটাই হয়তো জীবনের শেষ কথা।

ধোলাই খালটি তখনো মানুষ হয়ে ওঠেনি।
খাল বলতে যা বোঝায় তাও ছিল না আসলে।
আবর্জনায় পোরা দুলাই নদীর শেষ স্মৃতি চিহ্ন।
তারই অনুদৈর্ঘ্যে দাঁড়িয়ে হল্লা করতে করতে
সাদা সুতোয় রঙিন মাঞ্জা দিয়েছি এন্তার।
সুতোয় কাচের গুড়ো লাগিয়ে দিয়েছি তরবারীর জেল্লা আনতে।

সাকরাইনের দিনে সারাদিন দুরন্তপনায় সময় কেটেছে
আকাশে বর্ণিল ঘুড়ির আমন্ত্রণ, ঘরে পিঠে-পুলির।
কার ঘুড়ি কত ওপরে ওঠানো যায় তার একটা কঠিন পাল্লা চলত।
আর চলত কাটাকাটি।
কত ঘুড়িঅলার মনোকষ্টের যে কারণ হয়েছি!

বাতাস পেয়ে আমার ঘুড়ির আস্তিন ফুলে ফুলে উঠছে
সুলতানের আঁকা পেশিবহুল পুরুষের বাহুর মতো- এখনো চোখে ভাসে
কখনো দেখতাম নাটাই আর আমার কথা শুনছে না
ঘুড়িই তার প্রভু তখন। তার আদেশে কখনো সরীসৃপের মতো সরসর করে
সুতো বিমুক্ত করছে কখনোবা গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের ভেতর।

এখন আর ঘুড়ি ওড়ানো হয়না
অবশ্য ঘুড়ির সাথে সম্পর্কটা চুকে যায়নি একদম
আমরা এখন নিজেরাই একেকটা ঘুড়ি
জীবন নাটাইয়ের সুতো ধার নিয়ে ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে যাই
আচমকা সুতো ছিঁড়ে কোনদিন ভোকাট্টা হব কে জানে!

বৃষ্টির পাঠ

আজ ঘুম থেকে জেগেই দেখি
ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে
একেবারে কুকুর বেড়াল!
ঢাকা ঢেকে গেছে - জলে, কাদায়, সোঁদা গন্ধে!
ধুলোর উত্তরীয় ধুয়ে ফেলে পাতারা সেজেছে তারুণ্যের দীপ্তিতে।

অভিযাত্রীর মতো সেজে-গুজে পথে বেরুলাম।
ওমা! এ পথ যে আমার অচেনা
রাস্তা চুই চুই পানিতে সয়লাব
কারেন্টের তারে ভেজা কাক
পথ-ঘাট পুরো জন-মানব শূণ্য
যেন বা রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি।
ভয়ংকর দর্শন কোনো দৈত্য
শহরের সবাইকে নিকেশ করে
রাজকন্যাকে রেখেছে বন্দী করে-
আমি আগুন্তক রাজপুত্র
আমার দায়িত্ব দৈত্যের প্রাণ ভোমরাকে হরণ করে
রাজকন্যা উদ্ধার!

গাড়ির শার্সিতে হীরের কুচির মতো বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়ছে
দৃষ্টির গম্যতা নেমে এসেছে বেশ নিচে
পিচের রাস্তা, রিকশা-স্কুটার আর ইতঃস্তত পথযাত্রীকে
মনে হচ্ছে অপার্থিব কিছু।

কল্পনা আর বাস্তবের ব্যবধান ঘুচে গেল?
যে সূক্ষ্ম ফারাক তাদেরকে আলাদা রাখে
তা বেমালুম গায়েব।
তখন তোমার কথাই মনে হলো।
পকেট থেকে মুঠো ফোন বের করে বার্তা পাঠালাম
'কী করছো?'
লিখতে চেয়েছিলাম 'তোমার কাছে বৃষ্টির পাঠ নিতে চাই'
লেখার সাহস পাইনি!

জন্ম ১৯ জুন ঢাকায়।
ছোটবেলায় ছবি আঁকা, বিজ্ঞানের প্রজেক্ট বানানোর মতো নানা নেশার পেছনে ছুটে অবশেষে থিতু লেখালেখিতে। ছোট গল্প, উপন্যাস এবং ছড়ায় স্বচ্ছন্দ হলেও ছড়া লিখতে ভালবাসেন। দেড় যুগ ধরে যুক্ত আছেন ক্রীড়া লেখালেখিতে। সম্পাদনা করেছেন একাধিক ম্যাগাজিন। ইতোমধ্যে মোট পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি লেখক অভিধানে ভুক্তি রয়েছে লেখক হিসেবে।
পেশায় চিকিৎসক জহিরুল ইসলাম নাদিম ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত ও এক কন্যার জনক।